

ପାଞ୍ଚମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର
ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର



ସମା ମିତ୍ରାନ୍ଦ ମିତ୍ର ମହାରଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ

ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ
ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଆନା ପାଞ୍ଚ

କୋମା-୧୫
ମାସିକ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚିତ

বহুক্ষেত্রে শুধু নারায়ণ শিলা বা শিবলিঙ্গে পূজা হয়। কিন্তু বিগ্রহ
আনলে নতুন করে নারায়ণ শিলা আনতেই হবে। ঐ নারায়ণ
শিলা প্রমাণ করে আমরা পৌত্তলিক নই। আমরা পুতুল পূজা
করি না। ভক্ত নারায়ণ শিলাকে বুকে করে চোখের জলে বুক
ভাসিয়ে ফেলে। বলে, আহা কি সুন্দর তোমার চোখ দুটো, কি
সুন্দর তোমার হাসি। ঐ দেখা, পুতুল পূজার দেখা নয়। রূপের
মধ্যে অরূপকে দেখে। দেখার মধ্যে অদেখা লুকিয়ে পড়ে।
প্রতিমাটা যে প্রতীক একথা মনে করিয়ে দেয়।

স্বামী শিবানন্দ গিরি



স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

Central Regn. No.—R.N. 32810/1977
Postal Regn. No. KOL RMS/38/2025-2027

॥ ঊনপঞ্চাশ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা ॥

শ্রাবণ

১৪৩৩



শ্রীগুরু

গুরুকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া না গুরুকে একান্তে পাওয়া, কোনটা ঠিক? দুটোই ঠিক। দু'টি ভাবেই আমরা ভগবানকে পেতে চাই। এমন কি নিজের স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, আত্মীয়, বন্ধু সকলকেই আমরা একান্তেও পেতে চাই, আবার সবার সাথেও পেতে চাই। ছেলের বিয়ে দিলাম, পুত্রবধুকে পাব বলে। কিন্তু পরিচিত অপরিচিত সবাইকেই ডাকলাম উৎসব পূর্ণ করার জন্যে। গুরু পকেটে পুরে ফেলার বস্তু নয়। আত্মস্থ হয়েই তাঁকে আত্মসাৎ করা যায়। একান্তে পাওয়া মানে, একান্তভাবে একান্ত হয়ে যাওয়া। একপাশে একান্তে বসে একা একান্ত হতে হয়। ভগবান গীতায় যে শরণাগতির পথ দেখিয়েছিলেন, সে পথের আর

এক নাম একান্ত পথ। ঐকান্তিক ধর্ম। অন্তে যদি এক না হই, তবে কিসের একান্ত। ভাল কিছু রান্না করে যেমন সবাইকে দিতে ইচ্ছা করে, ভাল একখানা ছবি পেলে তা যেমন সবাইকে ডেকে দেখায়, তেমনি সদগুরুর কথা সবাইকে বলতে ইচ্ছা করে। বলার একটা আনন্দ আছে। ভাগ দেবার একটা তৃপ্তি আছে। এটি অমূল্য বস্তু। যে সবার সাথে পেতে শিখেছে, সে-ই একান্তে পায়। ভীড়ের মধ্যেও সে একা। একা পাওয়ার জন্যে যেখানে কাড়াকাড়ি, সেখানেই বিবাদ। তোমার গুরু একটি মনুষ্য দেহে বাস করেন। যেমন তুমি বাস কর একটা বাড়ীতে। বাড়ীটা তুমি নও। দেহটাও তেমনি গুরু নয়। দেহটা ফেলনাও নয়। গুরু থাকেন, অতএব ঐ দেহ গুরুমন্দির। অতএব তাঁর মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে। একটা গ্রন্থের মধ্যে অনেক মূল্যবান জ্ঞান আছে। যদি ঐ জ্ঞানটিকে আত্মসাৎ করে নিতে পার, তবে সে জ্ঞান একান্ত তোমারই রইল। তুমি না দিলে কেউ তার ভাগ নিতে পারবে না। কিন্তু বইটা নিয়ে টানাটানি করতে গেলে একটা পাতাও ভাগ্যে পড়বে না।

স্বামী শিবানন্দ গিরি



প্রশ্নোত্তরের কথা

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। তিনি কি বলতে চেয়েছেন? তিনি কি বৈরাগ্য বিরোধী?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ যদি বৈরাগী না হন তাহলে বৈরাগী জন্মায়নি। আমি যেটুকু রবীন্দ্র সাহিত্য পড়েছি তাতে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় বৈষ্ণব খুঁজে পাইনি। তাঁর আশ্রমিক পরিবেশ, বৃক্ষতলে অধ্যাপন, নগ্নপদে বিচরণ, ছাতিমতলায় ধ্যান, রেশমী আলখাল্লা, শুভ্র শ্মশ্রু কেশরাশি আমাদের মনে একমাত্র তপোবনের মুনি ঋষিদেরই স্মরণ করায়। কিন্তু সে বৈরাগ্য তাঁর বাইরের নয়। মন না রাঙায়ে বসন রাঙালি কি ভুল করিলি যোগী। গানটি অতুলপ্রসাদের। অতুলপ্রসাদও সাধক ভক্ত কবি। ভক্তি কিংবা ভক্তকে তিনি ছোট করেননি এখানে। কিন্তু ভক্ত সেজে পেন্নাম কুড়োনকে ধিক্কার দিয়েছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর গবেষণাপত্র ‘রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর প্রভাব গ্রন্থে প্রশ্নে উল্লিখিত এই কবিতাটির বিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে যুগটা ছিল অবক্ষয়ের যুগ। প্রকৃত বৈষ্ণব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। রবীন্দ্রনাথ যাদের দেখেছিলেন তাদের নেড়ানেড়ি কর্তাভজার দল বলতে

হয়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যকে হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও তথাকথিত বৈষ্ণব নামধারীদের সমর্থন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের থেকে দুই বছরের ছোট বিবেকানন্দও সহ্য করতে পারেননি ওদের মাতামাতি। অহেতুক অশ্রু বর্ষণ, অধৈর্য নৃত্যবিলাস অথবা হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার তাঁর মনে কীর্তনপ্রীতিতে আঘাত হেনেছিল। তাই একদিন কন্সকুঠে বলেছিলেন, খোল করতাল টেনে ফেলে দাও। দেশটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমপাড়ানী গান আর নয়। এবার জাগার গান গাও। পাখোয়াজ মাদল দামামা কোথায় ছিল। পেনেটির উৎসবে স্বামীজীকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব দেখাতে। কিন্তু পারেন নি। শ্রীম-র বর্ণনায় পেয়েছি, ভক্ত বৈষ্ণবদের বিকট অঙ্গভঙ্গি যখন পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছিল, তখন ঠাকুর নিজেই প্রকৃত বৈষ্ণবের রূপটি প্রকাশ করার জন্য ভাবে আবিষ্ট হয়ে করতালি দিতে দিতে মৃদু মৃদু নৃত্য করেছিলেন, সে স্মৃতি ভোলায় নয়। সমস্ত বিষ ঠাকুর কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সে যুগের নীলকণ্ঠ এ যুগে নিয়েছিলেন কণ্ঠভরে ক্যানসারের যন্ত্রণা। ভক্ত কর্কট রোগের প্রভাব, মর্কট বৈরাগ্যের মুক্ত মাঠ পেরিয়ে আজ আমরা প্রকৃত বৈষ্ণব পেয়েছি অনেক অজস্র। এ সবই রামকৃষ্ণের দান। রবীন্দ্রনাথ এ ফসল দেখে যাননি। তাঁর উজ্জ্বল ক্ষোভ ছিল। বৈষ্ণবীয় মতবাদে তাঁর আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল তাঁর মাতামাতিতে। তিনি বলেছেন, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। সমস্ত জোরটা ঐ ‘আমার নয়’ কথাটির ওপর। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি লভ্য কি না সে বিষয়ে কটাক্ষ নেই। তিনি যেটা চেয়েছিলেন সেটা হল ‘অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ’। এটিই তো প্রকৃত মুক্তি। বন্ধন বয়ে পলাতক কোনদিন মুক্তি পায় না। বন্ধনময় মনুষ্য জীবনই তো মুক্তির পথের চাবিকাঠি। রামপ্রসাদও তো বলেছেন, ‘সংসার ধর্ম বড় ধর্ম মা তাই পারি না ছেড়ে যেতে’। এখানেও রামপ্রসাদ সংসার বিবাগীকে আক্রমণ

করেননি। তার নিজের পথ নির্বাচনটি তাই বলেছেন। রামপ্রসাদের বক্তব্য তাঁর আর একটি গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘পূজা উপাসনা সকলই গো ফাঁকি, শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি যতখানি সত্যি, ততখানি সত্যি ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ায় আমরা তো তাকেই ডাকি। শিশু যেমন মাকে ডাকার নেশায় ডাকে, তেমনি করে ডাকি। আবার আড়ম্বরের বাহুল্যতা তাঁর চরণ ছুঁতে বাধার সৃষ্টি করে তাও সত্য। এখানেই তাঁর প্রতিবাদ। যত মত তত পথে আমরা বিশ্বাসী। অশ্রু স্বেদ কম্প

হৃষ্কার সবই সাত্ত্বিক বিকার। শাস্ত্রসম্মত পরীক্ষিত সত্য। রবীন্দ্রনাথ এর বাইরে নয়। তাই কান্না পাচ্ছে না তবু অশ্রুবর্ষণের তিনি বিরোধী। ভাবের লেশমাত্র নেই, তবু সভার মধ্যে নেচে ওঠা কিস্বা চিৎকার করে অপরের অসুবিধা সৃষ্টি করার তিনি বিরোধী। ন্যাকামীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ। নইলে কেউ বলতে পারে না, ‘আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে’। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা। উপনিষদীয় ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথের মত কজন ত্যাগের মহিমা গান করেছেন? এত বড় ত্যাগী কি বৈরাগ্য বিরোধী হতে পারেন?

উত্তরদাতা- স্বামী শিবানন্দ গিরি

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবের ৭৮-তম স্মরণতিথি পূজা

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, শুক্রবার শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবের স্মরণতিথি পূজা উপলক্ষ্যে আনন্দ আশ্রমে বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা নাম-সংকীর্তন।

সকল ভক্তের উপস্থিতিতে নাম-সংকীর্তন পূজা সার্থক হোক।



চলো মন বৃন্দাবন

‘দেখে আয় প্রেমের বৃন্দাবন, যেথায় মধুর মধুর বংশী বাজে নিত্যশুদ্ধ মন’। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮৫, আমরা ৪৮ জনের একটি দল স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজজীর সঙ্গে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভোর না হতেই সকলে তৈরী, ‘রাধারাণীকি জয়, মহারাণীকি জয়, ‘ধ্বনি দিয়ে শ্রীগুরু সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে পদযাত্রা শুরু হলো। নাম করতে করতে প্রথমেই আমরা মানসিংহের নির্মিত প্রাচীন গোবিন্দ মন্দিরে গেলাম। পান্ডা ঠাকুর বোঝালেন, মন্দিরটি আগে সাততলা ছিল। আওরঙ্গজেব চারটে তলা ধ্বংস করে দেন। এখন তিনতলা অবস্থিত রয়েছে। মুসলমানদের আক্রমণের সময় মানসিংহ গোবিন্দজীকে জয়পুরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এখন এই মন্দিরে গিরি গোবর্দনধারীর মূর্তি রয়েছে। দু’পাশে গৌর নিতাই। খুব দুঃখের কথা, এই গৌর নিতাই মূর্তিকে পান্ডারা রামলক্ষণ বলে সকলের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন। পান্ডা ঠাকুরের ভুল বোঝানো হয়ে গেলে মহারাজ সকলকে ডেকে প্রকৃত তথ্য বুঝিয়ে দিলেন।

মানসিংহ আকবরের সেনাপতি ছিলেন। আকবর সর্বধর্মসমন্বয় চেয়েছিলেন। মহম্মদ ঘোরী, তৈমুরলঙ্গ

বৃন্দাবন আক্রমণ করেছিলেন ধর্ম নষ্ট করতে নয়, মণিমুক্তো লুণ্ঠন করতে। বৃন্দাবনের লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে যেতে কত যে উট ঘোড়া লেগেছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। এখানকার লোকের ভগবানের নামে যা পেত, নিজেরা খরচ করতেন। তাই বৃন্দাবনের অনেক সম্পদ ছিল। বারবার লুণ্ঠ করার ফলে বৃন্দাবন বনে পরিণত হল। ইতিহাস দেখলে তার পাতার ভাঁজ খুলে খুলে দেখতে হবে। এখানকার গাইডরা বিভ্রান্তিকর কথা বলছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়া উচিত। এই মন্দিরের জগমোহন অংশটি দেখে মনে হচ্ছে সাততলা ছিল কিনা সন্দেহ। মন্দিরের চূড়াটি হয়তো উচ্চতায় সাততলার সমান ছিল। সেই চূড়ার ওপর সওয়া মন ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বলতো। মহাপ্রভু যখন রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন তখন এই মন্দির ছিল না? চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রাধারাণীকে কেউ চিনতো না। শ্যামের বামে যে রাধা থাকবে কেউ জানতো না। মহাপ্রভু এ প্রথা চালু করলেন।

‘বৃন্দাবনে দেখিনিতো এমন অভিসার। তুমি নইলে কে জানাতো প্রেম রাধার।’ তখন ছিলাম শিশুমতি না জানিতাম পিরীতি। কৃষ্ণের যে কথা ভাগবতে নেই, বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে। সে সব চিত্র এই মন্দির গায়ে আছে। অর্থাৎ এই মন্দিরে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব আছে। যেমন উৎকীর্ণ মূর্তিতে দেখা যাচ্ছে, রাধারাণী একহাতে পান দিচ্ছেন গোবিন্দকে। পান দেওয়া মানে ‘প্রেম দেওয়া’। কৃষ্ণ রাধারাণীকে চুড়ি পরাচ্ছেন, দান দিচ্ছেন এসবও মন্দিরগায়ে খোদাই করা আছে। রূপ গোস্বামীরা এসব করে গেছেন। চৈতন্যপ্রভুর পর ধর্মে বিরাট ধাক্কা এসেছিল। প্রভু চলে গেলেন, চারিদিকে লোক বসিয়ে গেলেন। বৃন্দাবনের সবকিছু পুনরুদ্ধার করতে তাদের অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। অথচ পান্ডারা নির্বিবাদে গৌর নিতাইয়ের মূর্তিকে রাম-লক্ষ্মণের মূর্তি বলে চালাচ্ছে।

অজুহাত কি? এখানে গৌরনিতাই লোকে ভালো চেনেনা। আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি দেখে, এতোবড় অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ নেই, কোন প্রতিকার নেই, বললেন মহারাজ। মন্দিরের গায়েও লেখা আছে, ‘মাঝে গিরি গোবর্দ্ধনধারীর মূর্তি। দুপাশে গৌর নিতাই’। এতো বড় প্রমাণকেও মিথ্যে করে দিয়ে এখানে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে। খাস মুশলমানেরা যত না ক্ষতি করেছে, হিন্দুরা মুশলমান হয়ে হিন্দুধর্মের দেশী ক্ষতি করেছে। যেমন-কালাপাহাড়। রূপ-সনাতন মারা গেলেন, শ্রীজীবের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন বাকী কাজের ভার। শ্রীজীবের সঙ্গে নরহরি ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর এলেন। একপাশে আগ্রা, একপাশে দিল্লী, মাঝে মথুরা বৃন্দাবন। মানসিংহ ইচ্ছে করেই দু’পাশে মুসলমান প্রতিবেশী রেখে মাঝে গোবিন্দজীর মন্দির তৈরী করেছিলেন।

এরপর আমরা গেলাম ৬৪ মহাস্তরের সমাধি মন্দির দর্শন করতে। এই জায়গায় মহাপ্রভু এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ জায়গা। মহাপ্রভু তো বৃন্দাবনের কত জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন, তবে এই জায়গাটির এতো মাহাত্ম্য কেন? কারণ, এখানকার ভক্তরা প্রভুকে মনে রেখেছে। প্রভুর পদচিহ্ন পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে। বড় মন্দির করেনি। শুধু চরণচিহ্নটুকু ধরে রেখেছে। প্রভুর চরণের চারিদিকে পাথর দিয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম তৈরী করা আছে। বড়বড় মহাত্মা, মহান্তগণ দেহ রাখার সময় বলে গেছেন এইখানে তাদের সমাধি দিতে। অর্থাৎ বৃন্দাবনে বাস হবে যুগ যুগ ধরে। যাঁরা অন্যত্র শ্রীচৈতন্যের পূর্বে মহাপ্রয়াণ করেছেন আমন অনেকের নামে সমাধি বেদী তৈরী করা হয়েছে এই ৬৪ মহাস্তরের সমাধি মন্দিরে। যেমন রামী চন্ডীদাস, পদ্মাবতী, জয়দেব, বিশ্বমঙ্গল। তাই নামকরণ করা হয়েছে ‘৬৪ মহাস্তরের সমাধি মন্দির। সম্প্রতি শিবানন্দ গিরি মহারাজজীর সমাধি মন্দির এখানে করা হয়েছে।

এবার গন্তব্যস্থল শ্রীশ্রীকাত্যায়ণী পীঠ। রাধারাণী গোপীদের নিয়ে কাত্যায়ণী মায়ের পূজার জন্য একমাস ধরে ব্রত করেছিলেন। সারাদিন উপবাস করে যমুনায় স্নান করে সন্ধ্যাবালায় পূজা সমাপনান্তে উপবাস ভঙ্গ করতেন। একমাস পর ব্রত উদযাপনের দিন এই মন্দিরে এসেছিলেন পূজা করতে। ‘বুড়িমা’ তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এখানে সিংহবাহিনী দশভূজা দুর্গামূর্তি। এটি একান্নপীঠের একপীঠ। মায়ের কেশ পড়েছিল এখানে। মহারাজ বোঝালেন, কেশ স্বামী সোহাগের প্রতীক। মাথা যার কাছে বিকিয়েছি, কেশ তো তাঁর কাছেই থাকবে।

বিকলে মহারাজজীর সঙ্গে যমুনার তীরে গেলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জলের ধারে সিঁড়ির ওপরে সকলে বসলাম। এটা কেশী ঘাট। কৃষ্ণ এখানে কেশী দৈতকে বধ করেছিলেন। এই সেই যমুনা, আজও নিত্যপ্রবাহিতা, যার তীরে এবং নীরে শ্রীকৃষ্ণের যতক লীলা। এই সেই যমুনা, যে কৃষ্ণের জন্ম লগ্নে মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাবার জন্য গোবিন্দকে পথ করে দিয়েছিলেন। এই সেই যমুনা, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, দানলীলা যতকিছু সব এখানেই হয়েছিল। এই যমুনার কূলে বসে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিরহে চোখের জল ফেলেছেন। সেই সঙ্গে গোপীরাও। ষোড়শ গোপীনির চোখের জলেই কি যমুনার এত স্ফীতি? ভাবতে পারছি না, অনুভূতি কাজ করেছে না। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোয় যমুনার তীরে বসে মহারাজের সঙ্গে সকলে খানিকক্ষণ নাম করলাম। তারপর যমুনাকে প্রণাম জানিয়ে এলাম বৃন্দাবন বিহারীলালজীকে দর্শন করতে। তাঁর আর এক নাম ‘বাঁকাবিহারী’। বৃন্দাবনের প্রধান আরাধ্য দেবতা। এখানে ঝাঁকি দর্শনের ব্যবস্থা। অর্থাৎ ২/৪ মিনিট করে দর্শন হয়, আর পর্দা টেনে ঢেকে দেওয়া হয়, বিহারীলালজীকে। কথিত আছে, এক ভক্তের আকুতিতে সাড়া দিয়ে বাঁকাবিহারী ভক্তের সঙ্গে চলে

গিয়েছিলেন। সেই থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যাতে ভক্ত আর ভগবান কেউ কারোর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে না থকাতে পারেন। মহারাজ এই বাঁকি দর্শনের একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের দেবতা। প্রেমের দৃষ্টি সোজাসুজি বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেনা। পলক পড়ে যায়। তাই প্রেমের ঠাকুর মাঝে মাঝে পর্দা টেনে দিয়ে পলক ফেলছেন। এই ব্যাখ্যাতেই মন বেশী ভরে গেল। রাত্রে আহারের পর মহারাজের মুখে আবার ভাগবতী কথার আশ্বাদন। রাত্রে নিদ্রা, বিশ্রাম। এরপর গেলাম নিকুঞ্জবন দেখতে। সেখানে তমাল গাছ আছে। মহারাজ গাছটিকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আলিঙ্গন প্রণাম করলেন। দেখাদেখি আমরা সকলে। এক বিচিত্র অনুভূতি। এই বনে আরও নানারকম গাছ আছে। নিকুঞ্জবন, নিধুবন সব জায়গাতেই গাছগুলি ছোট ছোট। বৃন্দাবনের গাছ সাধারণতঃ বড় হয়না। ব্রজধূলি মাখতে তারা সবসময়েই নত হয়ে থাকে।

‘ধূলি নয়রে ধূলিকণা গোপী পদরেণু। এ ধূলা ভিক্ষা করে নন্দসূত কানু’। শোনা যায় মুনি ঋষিরাই বৃন্দাবনে গাছ হয়ে জন্মান। ব্রজের তৃণগুল্মলতা হয়ে জন্মানোর জন্য বহুজন্ম সাধনা করেন। কৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠিয়েছেন ব্রজের সংবাদ আনতে। কোথা দিয়ে দিনগুলো কেটে গেছে উদ্ধবের খেয়াল নাই। দশমাস পরে উদ্ধব ফিরে যাচ্ছেন মথুরায়। মন চাইছে না। বারবার প্রার্থনা করছেন, মাধব, ওগো ব্রজের মাধব, আবার যদি জন্ম হয়, আমি যেন ব্রজের তৃণগুল্মলতা হয়ে জন্মাই। আর যেন আমার ব্রজ ছেড়ে যেতে না হয়। জন্ম জন্ম আমি যেন ব্রজের ধূলিতে মিশে থাকি।

‘বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে, সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে। নিত্য নিকুঞ্জবনে সখীসনে অভিসারে, এসে কিশোরী আমায় দলিতেন শ্রীচরণে।। যমুনার ঠিক উপরেই শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনের অপরূপ মূর্তি। মন্দিরের ভেতরে

সহস্রফণা নাগের ওপর গোপাল দাঁড়িয়ে আছেন। যে গাছটির উপর থেকে দহতে লাফিয়েছিলেন সে গাছটি মন্দিরের পাশেই রয়েছে।

নানান মনস্কামনা প্রার্থনা করে ভক্তের দল সেই গাছে লাল কাপড়ের টুকরো বেঁধে দিচ্ছে। এই কালীয়দমন মন্দিরের কাছাকাছি এমন এক মন্দিরে গেলাম যেখানে গোছাগোছা বেত রয়েছে। মহারাজ বুঝিয়ে দিলেন বৃন্দাবন দর্শন না করলে জগন্নাথ দর্শন পূর্ণ হয়না। কালীয়দমন করে এসে যশোদানন্দন এই মন্দিরে বিশ্রাম করেছিলেন। জগন্নাথ দর্শন করে সেখান থেকে বেত এনে এই মন্দিরে জমা দিতে হয়। এখানে কৃষ্ণমূর্তির পিছনে নন্দ-যশোদার মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তি রূপসনাতন মাটির তলা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই মন্দিরে এলে চারধাম যাত্রা পূর্ণ হয়। এর কাছেই বস্ত্রহরণলীলার গাছ দেখলাম, যার উপরে উঠে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এদিনের সকালবেলার শেষ দর্শনের স্থান ‘নিধুবন’। বৃন্দাবনের অতি মনোরম জায়গা নিধুবনে হরিদাস গোস্বামীর সমাধি মন্দির আছে। এই নিধুবনের মাটির তলা থেকে হরিদাস গোস্বামী বাঁকেবিহারীর মূর্তিটি উদ্ধার করেছিলেন। এখানে একটি ঘর আছে নাম ‘সেবাকুঞ্জ। রাধাকৃষ্ণের মিলনমন্দির। ঘরটিতে খাট বিছানা পরিপাটি করে সাজানো। এখনো বৃন্দাবনের মানুষ বিশ্বাস করে প্রতিদিন রাত্রে এখানে রাধাগোবিন্দের গোপন মিলন হয়। এই বনে অগণিত বাঁদর থাকে। সন্ধ্যে হলে একটা বাঁদরও নিধুবনে থাকেনা সব বাইরে বেরিয়ে আসে। ভোরবেলায় কীর্তনের দল নিধুবনে প্রবেশ করলে এরা কোথা থেকে এসে ঝুপঝাপ পথের দু’ধারে মাথা নীচু করে বসে পড়ে। এ এক অদ্ভুত বিরল দৃশ্য।

হঠাৎই মহারাজের শ্রীমুখে এক অপূর্ব অনাস্বাদিত ঘটনা শুনলাম এই নিধুবনের। নিধুবনে রাত্রে থাকা নিষিদ্ধ। মহারাজ বললেন, একবার নিধুবনে রাত্রে

আটকে গিয়েছিলাম। কখন গেট বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল করিনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেবাকুঞ্জের দিকে চোখ পড়লো, যে ঘরে রাত্রে রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলন হয়। ঘরে একটা দরজা, একটা জানালা। দেখি দরজাটা খোলা, ভেতর থেকে আলো আসছে, উঠে গিয়ে দেখলাম, খাটে সুন্দর করে বিছানা পাতা, পাশে একটা ছোট টুল। টুলের ওপরে একটা ছড়ানো লাল ফিতে, দুটো কাঁটা রয়েছে। ‘মাথার কাঁটা খুলে শুয়েছে। লাগবে যে’। হৃদয় স্পর্শ করা দৃশ্য। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। আরও কিছু দেখার সাধ মিটে গেল। এ দৃশ্য জীবনে ভুলবো না। মহারাজের মুখে ঘটনাটা শুনে আমাদের গায়েও কাঁটা দিয়ে উঠলো। ‘আমি দেখেছি, দেখেছি। নয়নভরে দেখেছি’। গিরি মহারাজ বলছেন, ‘শোন আমার বড় পুরস্কারের কথা। দিল্লী থেকে আমরা বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল ‘রাধাস্তমী’ রাধারাণীর জন্মদিন। রাত্রে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, কানে আসছে অসংখ্য নুপুরের ধ্বনি। ধ্বনিটা আমাকে চারিদিক থেকে ছেয়ে ফেলেছে। চোখ মেলে দেখি ঘরের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট মেয়ে নাচছে। ভাবছি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ,

এরা ভেতরে ঢুকলো কি করে? একটু বিরক্ত হয়ে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ দেখি একটা ছোট সুন্দর মেয়ে আমার হাতে ধাক্কা দিয়ে বলছে, আজ আমার জন্মদিন, আমাকে দেখতে যাবেনা? পলকে আমার সব বিরক্তি অভিমান ভেসে গেল। বললাম নিশ্চয় যাবো। আমার এই অল্প সাধন ভজনহীন জীবনে ঘটে গেল এক অসাধারণ প্রাপ্তি। এটাই বড় পুরস্কার। পরদিন ভোরেই ছুটে গোলাম রাধারাণীর জন্মস্থান ‘বর্ষাণা’ গ্রামে। কিছুতেই খুঁজে পাইনা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক বৃদ্ধ বললেন, এখানে গোপীনাথের মন্দির আছে। সেখানে গিয়ে দেখি, গোপীনাথকে রাধারাণী সাজিয়ে উৎসব হচ্ছে। সেই রাধারাণীকে নয়নভরে দেখলাম। মনপ্রাণ ভরে গেল। লুটিয়ে পড়লাম রাধারাণীর চরণে। ‘আপনা লুকাইতে প্রভু নানা ছল করে। লুকাইতে নারে প্রভু ভক্তজন স্থানে’। সত্য স্বপ্রকাশ চিরকাল। রায় রামানন্দও গোপন খবর লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। বলে গিয়েছিলেন। ভক্ত বলে যায়। (সেবার শিবানন্দ গিরি মহারাজ ভগ্ন কণ্ঠস্বর নিয়ে দিল্লীর কামানী হলে-ক্রিটিক সার্কেল অফ ইন্ডিয়ার পুরস্কার গ্রহণ করে বৃন্দাবনে এসেছিলেন)

-লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ



প্রণাম লহ ঠাকুর

ঠাকুরের কথা লিখতে বসে অনেক পুরানো স্মৃতি মনকে নাড়া দিচ্ছে। কোনটা আগে লিখব, কোনটা পরে লিখব, তা বুঝে উঠতে পারছি না। আবার লিখতে বসে মনে হচ্ছে কার কথা লিখব? ঠাকুর বিশ্বনাথ, তিনি বিচিত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলার শক্তি আমার লেখনীর নেই। তবু বিছিন্ন কত ঘটনা মনের মধ্যে ভেসে উঠছে ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। সেই ঘটনাগুলিই আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বলে যাচ্ছি।

ঠাকুর তুমি আমাদের কাছে এস। আমাদের কৃপা কর। আমাদের সহায় সম্বল তুমি। তোমার কথা কতটুকু জানাব। তুমি নিজেকে প্রকাশ কর। সকলের মধ্যে বিলিয়ে দাও। আমাদের জীবন পারাপারের কাভারী তুমি। তোমাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার বাবা গুরুপ্রসন্ন আঢ্য ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত। তিনি ঠাকুর বাড়ীতে আঢ্যিদা নামেই পরিচিত। মজার কথা ঠাকুরের মাও বলতেন আঢ্যিদা। ঠাকুরের বোনেরা বলতেন আঢ্যিদা। ঠাকুরের স্ত্রী (ফুলুদি) বলতেন আঢ্যিদা। আবার ঠাকুরের ছেলেমেয়েরা বলত আঢ্যিদা। বাবা ছিলেন সবার প্রিয় আঢ্যিদা।

ঠাকুরকে পেয়েছি আমরা গভীর দুঃখের মধ্য দিয়ে। আমার বড় দাদা মারা গেছেন। মা ও বাবা শোকে পাগলের মত অবস্থা। মার ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। বাবা দিশাহারার মত ঘুরে বেড়ান। এইরকম অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন আমরা দিন কাটাচ্ছি সেই সময় খবর পাওয়া গেল, বাবার এক বন্ধুর ছেলে নরেন খুব অসুস্থ। ডাক্তার জবাব দিয়েছে। ওরা উপায়ান্তর না দেখে ঠাকুরকে নিয়ে আসে। ঠাকুমা এখবর পেয়ে বাবা মাকে নিয়ে ওদের বাড়ী গেলেন। ঠাকুরের অলৌকিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলেন। ঠাকুর দুলে দুলে চলেছেন। সব সময় ভাবে বিভোর। নিজের গলা থেকে গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে রোগীকে সপাং সপাং করে মারতে লাগলেন। ক্রমে রোগী চোখ মেলে চাইল। গঙ্গা জল তার মুখে দেওয়া হল। জিজ্ঞাসা করা হল সে কি খাচ্ছে। উত্তর দিল, ডাবের জল। তারপর সে কিছু খেতে চাইল। দোকান থেকে রসগোল্লা এনে তার মুখে দেওয়া হল। ক্রমশ সে সুস্থ হয়ে কথা বলতে শুরু করল। ঠাকুরের এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে নিজের পুত্রও ঠাকুরের দয়ায় বাঁচতে পারত এই চিন্তা করে বাবা মা কান্নায় ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়ে মন প্রাণ সমর্পণ করেন। ঠাকুর বিশ্বনাথ কোনদিন আমাদের দীক্ষা দেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্তরের যোগ ছিল। তাঁর বাণী ছিল আমাদের দীক্ষা।

এরপর থেকে বাবা প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ঠাকুর বাড়ীতে কীর্তনে যেতেন। কোনদিন বাদ যেত না। বাড় বৃষ্টি সকল কিছু অগ্রাহ্য করে তিনি ঠাকুরের কাছে যেতেন। এমন কি দাঙ্গার সময় সকল বিপদ তুচ্ছ করে বেড়িয়ে পড়তেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। সামনে ছুরি মারছে, এমন দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছে। তবু তিনি দুহাত ওপরে তুলে অলিগলি মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যেতেন। তবু কোনদিন বাড়ী

ফিরে আসেননি। পরের দিন বাড়ী এসে সব ঘটনা বলতেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর ছিল এরকম আকর্ষণ বাবার সঙ্গে আমার ঠাকুরবাড়ীতে যাবার খুব ইচ্ছে হত। তখন আমি খুব ছোট, ছয় সাত বছর বয়স হবে। মনে আছে সন্ধ্যে রাত্রে আমি ঠাকুমার কাছে জেগে বসে থাকতাম। নটা বাজলেই বাবা চলে যাবেন। বাবা আমাকে বসে থাকতে দেখে ঠাকুমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেন। ঠাকুমা বলতেন, ও তোর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী যেতে চায়। বাবা কোনদিন নিয়ে যেতেন। কোনদিন নিয়ে যেতেন না। যেদিন যেতে পেতাম না সেই দিন সারা রাত ছটফট করতাম। ঠাকুমা আমার অবস্থা বুঝতেন। বাবা বেশীরভাগই আমায় নিয়ে যেতেন। সারারাত জেগে আমি কীর্তন শুনতাম। ঠাকুর হেসে বলতেন, তুই এখনো জেগে আছিস? আমার তখন খুব আনন্দ হত।

ঠাকুরের হোম, ঠাকুরের পূজা, ঠাকুরের কীর্তন এখনও আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসছে। নটার পর ঠাকুর স্নান করতেন, পরনে বেণারসী, হাতে মোটা মোটা দু'গাছা বালা, গলায় সোনার হার, পায়ে নুপুর পরতেন। কপালে তিলক চন্দনের ফোঁটায় সজ্জিত হয়ে যখন কীর্তনের ঘরে আসতেন তাঁর রূপের ছটায় সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে উঠত। মনে হত স্বর্গলোক থেকে কোন দেবতা মর্তে এসেছেন। তারপর শুরু হত পূজা। সে এক অভিনব পূজা। কোন মন্ত্র নেই। মুঠো মুঠো ফুল মাথায় ও পায়ে ছুঁইয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিতেন। এ পূজা আত্ম নিবেদনের পূজা। পূজার শেষে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করতেন। তারপর শুরু হত আরতি। এই আরতির পদ্ধতি এক বিচিত্র পদ্ধতি। নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে আরতি করতেন। মাঝে মাঝে সব শেষে রূপোর বাঁশী নিয়ে নাচতেন। এই উদ্দাম নৃত্য যারা দেখেছে তাদের চক্ষু সার্থক। এ দৃশ্য কোনদিন ভোলা যায় না।

ছোটবেলায় আমি অনেক সময় ঠাকুরবাড়ী থাকতাম। ঠাকুর পরিজন সকলের সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক হয়। সেই সম্পর্ক এখনও বর্তমান। ঠাকুরের সঙ্গলাভ আমার সৌভাগ্যে হয়েছিল। ঠাকুর যখন হালসীবাগানে থাকতেন তখন থেকেই আমি ঠাকুরের কৃপাধন্য। বাবার কাছে শুনেছি, ঠাকুর হোম করতেন ভীষণভাবে। সামনে হোমের শিখা বেশ বেড়ে উঠেছে। ছোট একটা লাল রঙের অন্তর্বাস পরে ঠাকুর লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যেতেন ও প্রান্তে, আবার লাফ দিতেন এ প্রান্তে। এমনিভাবে উন্মত্ত হয়ে হোম করতেন।

পূজা ও আরতির পর শুরু করতেন কীর্তন। এই কীর্তন ছিল এক মজার ব্যাপার। তাঁর কীর্তনের আসরে বিচিত্র ধরনের লোক। কোন ভেদাভেদ ছিল না। ধনী, দরিদ্র, মাতাল, লম্পট, চরিত্রহীন, এমন কি বারবণিতারও আগমন হত। ঠাকুর কীর্তন করতে করতে কারোর মাথায় চাঁটি মারতেন। কাউকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনতেন। কাউকে পা দিয়ে ধাক্কা দিতেন। ছোটবেলায় আমার খুব ভয় হত। ভাবতাম, ঠাকুর ওদের কেন কষ্ট দিচ্ছেন। একটু বড় হতে সে ভয় আমার কেটে গেল। কেউ হয়তো ব্যথায় ও দুঃখের জ্বালা নিয়ে কীর্তনে এসেছে। কেউ বা শোকে তাপে মুষড়ে বসে আছে। কেউ বা খুব খারাপ কাজ করেছে, মনে উদ্দিগ্ধতাব। ঠাকুর তাদের বিভিন্ন মন ও চিন্তাকে স্পর্শ করে জানিয়ে দিতেন, তিনি সকলের মনের কথা জানেন। কোন সংশয় না রেখে মন প্রাণ দিয়ে কীর্তন কর। আবার সকলের মনের কথাকে নিয়ে ছোট ছোট গান রচনা করে কীর্তন করতেন। সকলে তাদের প্রশ্নের উত্তর ঠাকুরের কীর্তনের মধ্যে থেকেই পেয়ে যেত। কী অপূর্ব তাঁর ক্ষমতা। এমনি নিবিড় ভালবাসায় সবাইকে ঠাকুর টেনে নিতেন নিজের মণিকোঠায়। আমার বাবা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

এই কীর্তনে অনেক ঘটনা ঘটত যা সকলকে অবাক

করে দিত। মনে আছে এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা কীর্তনে আসতেন। তাঁর স্বামী ছিল মাতাল। ঠাকুরের কাছে এসে প্রতিদিন কান্নাকাটি করতেন স্বামীকে ভাল করে দেবার জন্যে। একদিন তাঁর স্বামী রাস্তা থেকে খুব গালাগালি করতে থাকে। তাঁর স্ত্রীকে আটকে রাখায় ঠাকুরকে অজস্র কটুবাক্য বলে। ভদ্রমহিলা ঠাকুরের আদেশে স্বামীর সঙ্গে বাড়ী চলে যায়। বাড়ীতে স্ত্রীকে খুব মারধোর করে এবং সাবধান করে দেয়, যেন আর কোনদিন ঠাকুরবাড়ী না যায়। তা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা ঠাকুরের কাছে আসেন ও কাঁদেন। তাঁর স্বামী চিন্তা করলেন এত মারধোর করেও যখন তার যাওয়া বন্ধ করা গেল না, কিসের টানে সে যায় খোঁজ নিতে হবে। এই ভেবে তিনি একদিন চুপিচুপি ঠাকুরবাড়ী আসেন। কিন্তু ঠাকুরের চোখ এড়াতে পারলেন না। ঠাকুর তাঁকে বুক টেনে নিলেন। ঠাকুরের স্পর্শে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঠাকুরের চরণ জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। মহাপ্রভু যেভাবে জগাই মাখাইকে উদ্ধার করেন, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন ঠাকুর বিশ্বনাথ।

তাঁর কীর্তনের আসরেও এমন এক মাহাত্ম্য ও শক্তি ছিল যা সকলকে আকর্ষণ করে। সকল জীব সংসারের মধ্য দিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করে উদ্ধার হবে। সকল কালিমা ধুয়ে মুছে যাবে কীর্তনের সুরে। সে সুর এখনও শুনতে পাই আশ্রমে। তিনি সে সুরের তরঙ্গ ভীতে গোঁথে দিয়ে গেছেন।

আমার একমাত্র দাদার একবার কলেরা হয়। অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। স্যালাইন দেওয়া শুরু হয়। বাড়ীর সকলে খুব কান্নাকাটি শুরু করে। বাবা বাড়ীতে কোন কর্তব্য আছে বলে মনে করলেন না। সন্ধ্যাবেলা যথারীতি কীর্তনে গেলেন। সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তনে করছেন আর তাঁর চোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে। হঠাৎ ঠাকুর কীর্তন বন্ধ করে বাবার কাছে গিয়ে গলার মালা থেকে কিছু ফুল

ছিঁড়ে নিয়ে বাবার হাতে দিলেন। বললেন, বাড়ী গিয়ে ছেলেকে খাইয়ে দিবি, ভাল হয়ে যাবে। ঘরের সবাই বিস্ময়ে হতবাক। বাবা সেই ফুল নিয়ে জয় মা জয় মা বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ী এসে দাদাকে ফুল ধুইয়ে জল খাওয়ালেন। সেই ফুল খাওয়ার পরে দাদা পুরোপুরি ভাল হয়ে গেল। পরদিন আবার ঠাকুরের কাছে ছুটলেন। ঠাকুরের পা জড়িয়ে বললেন, আজ শুধু তোমার জন্য ছেলেকে ফিরে পেলাম। বাবা সব সময়েই বলতেন, আমার ভাবনা নেই, ঠাকুর আছেন। সব কাজ তিনি ঠাকুরের ফুল নিয়ে করতেন। তাইতে তাঁর সব কাজ হয়ে যেত। ঠাকুরের গানই ছিল তাঁর মন্ত্র। স্নানের শেষে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর মনের কথা জানিয়ে ঠাকুরকে ধ্যান করতেন। সব সময়েই তিনি সারা বাড়ী ঘুরে ঘুরে ঠাকুরের গান করতেন।

হালসিবাগানে ‘বসন্তোৎসবের’ কথা মনে পড়ে। গবুদার (গোপেন মল্লিক) পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান। ঠাকুরের স্ত্রী (ফুলুদি) কৃষ্ণ, বাদামদি রাধা, এছাড়া টুলুদি, বেলদি, সন্ধ্যাদি, ভুড়ুলী, ইনু, ডাক্তারবাবুর ছোট মেয়ে মিনু এবং আমি। আরও কয়েকজন ছিল তাদের নাম আমি জানতাম না। নাচ গানের মাধ্যমে এই বসন্তোৎসব অভিনয় হয়েছিল। প্রথম স্টেজে নেমে আমরা সকলে আনন্দ দিতে পেরেছিলাম। ঠাকুরের উৎসাহ আর প্রেরণা তিনি আমাদের সব সময়ই দিতেন। সেই পরমপুরুষ ঠাকুর আমাদের ছোট গভী মধ্যে থেকে আমাদের বিকাশ করেছিলেন।

এই বসন্তোৎসবের পর বাবার আমার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। আমাকে গান শেখাবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু আমার ঠাকুমা বাদ সাধলেন। তিনি বললেন গান শিখলে আমি নাকি সংসার করতে পরব না। বাবা ঠাকুরের মত চাইলেন। ঠাকুর মত দিলেন। তিনি বললেন, তোর মেয়ে খুব ভালভাবে সংসার করবে। সেই বাণী আমার মনে আজও গোঁথে আছে।

সাংসারিক কাজ কর্মকে কোনদিন অবহেলা করিনি।

গান শেখা শুরু হল। বাবা ঠাকুরের সামনে আমাকে বারবার গান করতে বলতেন। কিন্তু আমার খুব লজ্জা হত। কারণ বড় বড় গাইয়েরা থাকতো তাঁর সামনে, আমি কি গাইবো। কিন্তু বাবার অবাধ্য হতে পারতাম না।

ঠাকুর বাবার কান্ড কারখানা ও আমার অবস্থা দেখে মিটিমিটি হাসতেন। সেই যে ঠাকুরের সামনে গান গাওয়া শুরু করেছিলাম আজও বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েও আমি গান গেয়ে অনেক শান্তি পাই। গান আমার জীবনের একান্ত সাথী হয়ে আছে।

দাদার বিয়ের পর বৌদিকে নিয়ে ঠাকুর বাড়ী যায়। দাদার নাম শ্যাম আর বৌদির নাম রাধা। ঠাকুর দাদা বৌদিকে নিয়ে গান ধরলেন, শ্যাম আর রাধা। এইভাবে ‘রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল’ গানের সৃষ্টি হল। অনাথদা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে গান রচনা করতেন। বাবা কয়েকটা গানের সুর দিয়েছিলেন। সে গানগুলি হল ‘কবে অনাথ হইয়া’, ‘জয় বিশ্বনাথের জয়’ এবং ‘হে অনন্ত বিশ্বনাথ’। এখনও দুটি গান ঠাকুর বাড়ীতে গাওয়া হয়। বিয়ের পরদিন বাবা আমাকে ঠাকুরের একটি বই হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাইতে অনাথবাবুর লেখা গান ছিল আর ঠাকুরের কিছু কীর্তন ছিল। আমি সেই আশীর্বাদের অংশ আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। আমার স্বামীও ছিলেন ঠাকুরের প্রিয়পাত্র। ঠাকুরকে তিনি কতটা ভালবাসতেন জানিনা তবে ঠাকুরবাড়ীতে যখনই যাব বলতাম উনি রাজী হয়ে যেতেন। সারারাত জাগতে পারতেন না বলে ঠাকুর নিজেই ওনার শোবার ব্যবস্থা করে দিতেন। তবে ঠাকুরের কীর্তন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না। ঠাকুর আমাদের কোন দীক্ষা গুরু নন। তবে তাঁর অন্তরের সঙ্গে আমাদের অন্তর একটি সূতায় বেঁধে নিয়েছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীর নীচেরতলায় ডাক্তারবাবুর নার্সিংহোম

ছিল। ডাক্তারবাবুর কাছে আমার একটি অপারেশন হয়েছিল। সকাল এগারোটায় সে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেদিন ছিল শনিবার। রাত্রে যথারীতি ওপরের ঘরে খোল করতাল বেজে উঠল। তখন আমি আর নীচে থাকতে পারলাম না। হরিনাম আরম্ভ হয়ে গেছে। একটু পরেই ঠাকুর আসবেন। পূজায় বসবেন। আমি কাউকে কিছু না বলেই আস্তে আস্তে টলতে টলতে ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার কাছে বসে পড়েছি। মুখে তখনও ক্লোরোফর্মের গন্ধ বেরোচ্ছে। কথা বলার শক্তি নেই। আমাকে উপরে আসতে দেখে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বললেন, এ কী করেছ? পড়ে যাবে। তুমি অসুস্থ। যাও তুমি শুয়ে পড়। এখানে থেকো না কষ্ট হবে। অগত্যা আমাকে মন খারাপ করে নীচে চলে আসতে হল। বিছানায় শুয়ে খুব কাঁদতে লাগলাম কীর্তনে থাকতে পারলাম না বলে। নীচে থেকে ঠাকুরের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ঘুরে ঘুরে কীর্তন করছেন তাও বুঝতে পারছি। হঠাৎ দেখি মাথার ওপর জলের মত কি ফোঁটা ফোঁটা কি পড়ছে। একটু হাত পাতলাম। কি সুন্দর গন্ধ। কোথা থেকে আসছে বোঝবার জন্য উঠে বসলাম। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, এ তো জল নয়। ঠাকুর পূজা করেছেন। মা-এর চরণামৃত। কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। কোনদিন এভাবে তো পড়িনি। তবে কি ঠাকুর আমার অন্তরের বেদনা বুঝতে পেরেছেন। তাই আমায় দিয়েছেন মায়ের চরণামৃত। আর আমার দুঃখ রইল না। আনন্দে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানতে পারলাম না। সকালে উঠে নার্সকে বলছি ঠাকুরের দয়ার কথা। কিন্তু সে বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। কারণ এভাবে কোনদিন কিছু পড়তে শোনেনি। আমি কোনদিন ভুলতে পারব না সেদিনের কথা।

আমার মা-ও ছিলেন ঠাকুরের অনুগত। আনন্দে পূজা করতে মাকে কোনদিন দেখিনি। অথচ সারাদিন

সংসারে পরিশ্রম করতেন। সকলের পরিচর্যা করে মাঝে মাঝে এবং উৎসবে ঠাকুরবাড়ী তাঁর যাওয়া চাই। ঠাকুর আছেন তাঁদের মধ্যে। সব কথা ঠাকুরকে বলতেন। তাইতে তাঁর পূজা সারা হত। সারারাত জেগে ভোর পাঁচটায় বাড়ী ফিরে আবার সংসারের ঘানি টানতেন। কোন কষ্টই মনে হত না। এইভাবে নিজেদের মধ্যে ঠাকুরের আসন পেতে রেখেছিলেন।

আমার বাবা শঙ্কুকে (মহারাজ) ছোটবেলা থেকে খুব ভালবাসতেন। সব সময়েই বলতেন, ঠাকুরের উপযুক্ত ছেলে। আমরা দেখেছি ছ'বছর বয়স থেকেই শঙ্কু (মহারাজ) সারারাত ঠাকুরের কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজিয়ে যেত কোথাও শিখল না অথচ এইটুকু বয়সে কি সুন্দর খোল বাজাবার হাত। ঠাকুরও শঙ্কুর বাজনায় খুব খুশী হতেন। বাবা তাই সবসময়েই চিন্তা করতেন শঙ্কু যেন ঠাকুরের কাজ সম্পূর্ণ করে। হঠাৎ একদিন বিয়ের খবর যখন পেলেন, বাবা খুবই ব্যথা পেলেন। ভাবলেন কি রকম হবে এবার। তাই

সবসময় মনে করিয়ে দিতেন, ঠাকুরের নামটা বজায় থাকে। তুমিই আমাদের আশা ভরসা।

সুখে দুঃখে বেশ কিছুদিন কাটল। হঠাৎ বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বাবার শ্রাদ্ধ বাসরে শঙ্কু বলছে, জান সাবিদি, একদিন আঢ়িদা আমার রেডিওর দোকানের সামনে এসে ধমকের সুরে বললেন, জাগতিক সুখের জন্য তুমি দোকানদারি করতে আসনি। ঠাকুরের নাম গান প্রচার ও ভক্তপ্রাণে কীর্তন সুধারস করাবার দায়িত্ব তোমার। আঢ়িদা আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে এত ভালবাসতেন যে আমার কাছে ছুটে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম যে আঢ়িদা আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ঠিকই আছি। কিন্তু আঢ়িদার রাগ তখনও পড়েনি। কারণ আঢ়িদার ধ্যান ধারণা ছিল ঠাকুরের নাম। নাম গান প্রচারের প্রীতি। বাবা নেই। তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে। এটাই বার বার তাঁকে জানাব।

সাবিত্রী নন্দী (চুঁচুড়া)

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

কৈলাসের মাসিক সংঘ সংবাদ পত্রিকা

।। নিয়মাবলী।।

- প্রতি বাংলা মাসের পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়।
মাসিক চাঁদা তিন টাকা। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা।
- অতিরিক্ত ডাক খরচ লাগে না।
- পত্রিকা সময়মত না পেলে লিখে জানাতে হবে।
- সংঘের সংবাদ পরিবেশন, কীর্তন এবং সভায় আলোচিত গবেষণামূলক মূল্যবান তথ্যগুলি সংগ্রহ, নিদিধ্যাসন পত্রিকার উদ্দেশ্য।
- অতি মানব ও মহাপুরুষদেরজীবন ও মর্মবাণী সংগ্রহ এবং গবেষণা পত্রিকার প্রধান কাজ।
- প্রসঙ্গগুলি আশ্রমে বা আশ্রম আয়োজিত সভায় আলোচিত হবার পরই একমাত্র পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে।
- বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।
সম্পাদিকা—শর্মিলা ব্যানার্জী, ২১/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬
প্রকাশক—অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ফোনঃ ২৩৫২-৭৩২৯
মুদ্রক—শান্তিনাথ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

Statement about ownership and other particulars of

PANCH SIKE PANCH ANA (FORM - IV)

According to rule 8 of the Registrations of News Papers (central Rules 1956)

Place of Publication	Kailash, 21/2, Beadon St. Kol-6
Periodicity of Publications	Monthly
Printer's Name	Sri Arpan Bandyopadhyay
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2, Beadon Street, Kolkata-6
Publisher's name	Sri Arpan Bandyopadhyay
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2, Beadon St. Kolkata-6
Editor's Name	Sarmila Banerjee
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2 Beadon St. Kolkata-6
Name and Address of the Individuals who own newspaper	Kailash 21/2, Beadon St. Kolkata-6

Vol. XXXXIX No-12 (শ্রাবণ)
Publication Date : 7th August-2026

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা
(Panch Sike Panch Anna)

Postal Regn. No. : KOL RMS / 38 / 2025-2027
Central Regn. No. : R. N. 32810 / 1977
Licensed to Post without Prepayment

নদীতে নৌকা টলবে, এ তো স্বাভাবিক। আর যেখানে প্রতিনিয়ত
নিঃশ্বাস চলছে, রক্তপ্রবাহ ছুটছে, হাত পা ছুঁড়ছে, এমন একটা সদা
চঞ্চল খাঁচার মধ্যে মন যদি চঞ্চল হয়েই থাকে, তার জন্য চিন্তা কি?
কাজে মন দাও, নৌকা দুলছে কিনা ভুলে যাবে। মন চঞ্চল হবে,
আবার তাকে বশ করতেও হবে।

স্বামী শিবানন্দ গিরি

Published and Printed by—Sri Arpan Bandyopadhyay, on behalf of Kailash,
21/2, Beadon Street, Kolkata-700 006 and Printed at—Santinath Press,
16 Hemendra Sen Street, Kolkata- 700 006 • Edited by—Sm. Sarmila Banerjee,
21/2 Beadon Street, Kolkata-700 006 • Owned by Kailash, 21/2, Beadon Street.
Kolkata-700 006.